দৈনিক বাংলা

24

তারিখ ..12 FEB 1980
পৃষ্ঠা... .. ..কলাম .. ..

ভর্তি ডোনেশন এবং সাধারণের শিক্ষা

টাকা ছড়ালে বাঘের চোখ মেলে, প্রবাদটি প্রাচীন। বাঘের চোখের নয়। টাকার ক্ষমতার প্রচন্ডতা জ্ঞাত করাই এই প্রবচনের উৎস। টাকার ক্ষমতা সত্যি অপার। সর্বক্ষেত্রে, সর্বস্তরে সে অসীম ক্ষমতাবান। কিন্তু সাম্প্রতিককালে টাকার অপরিমেয় জয়গান স্বীকৃত হচ্ছে শিক্ষা-ঙ্গনে, বিশেষ করে স্কুলে ভর্তির সময়ে। বিষয়টি এখন আর ধামাচাপা দেয়ার পর্যায়ে নেই, তেমন ইচ্ছাও কারও নেই। এ এখন খোলামেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সীট থাকে না অনেক স্কুলেই। এ নিয়ে কথা বলা যায় না। কিন্তু টাকা দিতে পারলে অসম্ভব সম্ভব হয়, সীট তৈরি হয়ে যায়। অবশ্য টাকাটা কারও ব্যক্তিগত তহবিলে যায় না, স্কুলের তহবিল স্ফীত করা হয়। তারপর স্কুলের জন্য ভবন গড়া চলে। সুদৃশ্য ইমারত ওঠে। অডিটোরিয়াম জিমনেসিয়াম হতে থাকে, মাঠ, পথ, প্লে-গ্রাউণ্ড, গার্ডেন, লাইব্রেরী সব অভাব মেটান সহজ হয়ে পড়ে। তাই এ টাকার নামকরণ ডোনেশন বা অনুদান। ডোনেশনে ভর্তি এখন নিয়ম হয়েই দাঁড়িয়েছে। এতে দ্বিধা নেই, লজ্জা নেই—যাঁরা নেন তাঁদেরও না, যাঁরা দেন তাঁদেরও না। ফেলো কড়ি, মাখো তেল। এ চমৎকার বিনিময়। লাভ দু' পক্ষেরই। এই বাজারে সন্তান ভর্তি করা; আবার এই বাজারে বিদ্যালয়ের শ্রীবর্ধন। শুধু কি ভবন, কুরসি, কার্পেট, স্ক্রীন, ক্রোকারিজ, সীটিং রুম, মিটিং রুম, সিকরুম, টিফিন রুম স্কুলগুলোর রমা রমা আয়োজন।

এমন অনুদান প্রথার কবে থেকে শুরু বলা কঠিন, তবে মনে হয় এটা গত দু'দশকের অবদান। সত্তরের দশকে রাখ-ঢাক ভাব থাকলেও আশির দশকে তা সিক্রেট। ছেলে-মেয়ে ভর্তি করতে যে খোদ স্কুলকেও দিতে- থুতে হয়, এ তথ্য সবাই জেনে গেছেন, মেনেও নিয়েছেন। রেট নির্ধারিত নয়, যেখানে যেমন দিতে হয় বা দিয়ে পারা যায়। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর জন্য চল্লিশ হাজার পর্যন্ত চাওয়া যায়। ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টমের জন্য আরও বেশী। চাইতে বাধা নেই, তবে বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, সৌজন্য বা অন্য কোনও কারণে এ অংকে কমে যেতে পারে বটে কিন্তু একেবারে 'নিল' গেছে, এমন শোনা যায় কমই। প্রশ্ন, সব বিদ্যালয়ই কি ডোনেশনে ভর্তি করে স্কুল দ্বিতল ত্রিতল করতে প্রয়াসী? বিদ্যার্থীর পিতার কাছ থেকে প্রায় ছিনতাই-করা অর্থ দিয়েই কি সকলে শিক্ষার প্রসারে পক্ষপাতী, অবশ্যই না। তবে মুশকিল, যাঁরা ডোনেশন নেন না, তাঁদের বিপত্তি দু'রকমের। এক, লোকে বিশ্বাস করবে না; দুই, জন-মনে ধারণা হবে স্কুলের মান উঁচু নয়।

ব্যাপারটি বিশ্লেষণের দাবীদার। বিশ্বাস লোকে কেন করবে না? করবে না এজন্য যে, এ জাতীয় ডোনেশনের কথা কেউ গলা উঁচিয়ে বলতে আসবেন না। বলার ব্যাপার নয় বলে নয়, সন্তানকে স্কুল দুফে নিয়েছে এই প্রচারের তা হলে যে আর পথ থাকে না। আমাদের নিয়মই হচ্ছে এমন যে বহু কষ্টে যা পাঠ, তা কবুল করতে সংকোচ, বলতে হয় তার উল্টোটাই। এমন অবস্থায় মানুষ ধরেই নেয় মনে মনে—স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছে যখন, তখন বুঝতে হবে বেশ কিছু খসেছে। স্কুল স্বীকার করবে না নানা কারণে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে অপবাদের আশংকা। কিন্তু এ সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হচ্ছে না। ঢালাওভাবে সকলে ধরে নেন, সব স্কুলেই ভর্তি করতে অর্থ লাগে, লাগে অনুদানের রূপে।

এই নাজুক পরিস্থিতিতে একটি অধিকতর নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে; তা হচ্ছে আর আর সব ক্ষেত্রের মত এখন স্কুলেও ভর্তি করিয়ে দেওয়ার জন্য একটি দালাল শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে। দেখা যায়, ছেলে-মেয়েদের মা-বাবা কিংবা নিকটাত্মীয় নয়, সম্পূর্ণ বাইরের কেউ স্কুলে গিয়ে চাপ সৃষ্টি করছেন ভর্তির; একটি ভর্তির তদবিরে তারা সময় নিচ্ছেন অঢেল, তাদের চাপ তৈরির অধ্যবসায় অনবদ্য—নিজের কাজকর্ম ফেলে স্কুলে স্কুলে ধরনা দিয়ে বসে থাকার কী রহস্য? ভর্তি হলে দেখা যাবে, তাঁরা বিপুলভাবে লাভবান হয়েছেন অভিভাবকদের কাছ থেকে পুরস্কারের নামে; এমনকি হয়ত তাঁরা বলছেনও 'আমার এ জন্য স্কুলে অত টাকা ব্যয় করতে হয়েছে।' স্কুল তো শুনতে আসে না, মোকাবেলার অবকাশ নেই, অভিভাবক বাধ্য হয়ে তা বিশ্বাস করেন। ফলে বিষয়টি যে বেশ জটিল হয়ে পড়েছে তা বলা যায় এক কথায়। ডোনেশন নিলে তো কথাই নেই, না-নিলেই নেওয়ার অভিযান থেকে রক্ষা পাওয়া দায়। এর জন্য স্কুল নিরুপায় হয়ে ক্ষোভে গুমরে মরে, অন্যদিকে অভিভাবক অসহায়ভাবে ফড়িয়া শ্রেণীর যাঁতাকলে পড়েন।

এমন অবস্থা হতে পারতো না যদি শিক্ষাঙ্গনে ভর্তির ব্যাপারে সুবাতাস বইতো। প্রথমতঃ এখন স্কুল ত্যাগ করে না কোনও ছাত্র বা ছাত্রী; বদলীপত্রের সংখ্যা কমছে দিন দিন। উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের পরবর্তী শ্রেণীতে ঠাঁই দেয়া স্কুলের পবিত্র কর্তব্য ও দায়িত্ব। ফেল করলেও শিক্ষার্থী স্কুল বদল করে না- ফের পড়ে একই স্কুলে। এমন পরিস্থিতিতে স্কুলে নতুন ভর্তির জটিলতা বাড়ছেই। ডোনেশন দিয়ে শাখা বাড়িয়ে কিংবা না-বাড়িয়ে ছাত্র সংখ্যা এলোপাতাড়ি বৃদ্ধির অর্থ পড়ালেখার স্ট্যান্ডার্ড ক্ষতিগ্রস্ত করা। স্কুলশিক্ষার বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষকের ঘনিষ্ঠতা এবং প্রত্যক্ষ তদারক করা। লেক-চার-মেথড এখানে অচল, তাই প্রশ্ন ওঠে খাতা পর্যবেক্ষণের, লেখা দেখার, পড়া ধরার। নির্দিষ্ট পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনি-টের পিরিয়ডে আশি-নব্বই-শত সংখ্যক শিক্ষার্থীর তত্ত্বাবধান এক কথায় অসম্ভব।

অনেকটা এ কারণেও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় প্রাইভেট কোচিং-এর। ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ড দেখতেও পায় না যে ছাত্র বা ছাত্রী, তার পক্ষে ঘরে টিউটরের দাবী না তুলে বিকল্প কি? এই নিরুপায় পরিস্থিতি পর্যায়ক্রমে তৈরি করছে নতুন জট, তা হচ্ছে কোচিং শিক্ষকদের মধ্যে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর সঞ্চার। রেট বৃদ্ধিও এখন আর সমাধান নয়, এখন ছাত্রকে কোচিং সেন্টারে যেতে হবে। যাতায়াত, নিরাপত্তা, সময়—সব মিলিয়ে অভিভাব-কের অবস্থা করুণ থেকে করুণতর হচ্ছে দিনকে দিন।

এসবই পুরনো সংকট—আবর্তক সমস্যা। জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত চলে স্কুলগুলোতে অস্বস্তি, অশান্তি। কোথাও তর্কাতর্কি, মারামারি, হাতাহাতি। কারণ ভর্তি। কর্তৃপক্ষের ভাষ্য সীট নেই; ভর্তি প্রার্থীপক্ষের মন্তব্য—আমরা কোথায় যাই? এর জবাব এই দুই পক্ষের কারও জানা নেই। তবু সংকটের যত দায় বর্তায় এদের ওপরই।

ক্রমে এ সংকট বিরাট আকার ধারণ করছে। সরকারী এবং যশ-খ্যাতিসম্পন্ন বেসরকারী কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য এ সমস্যা সমস্যাই নয়, কেননা পুরো সমাজই তাঁদের সহায়। তাঁদের অঙ্গনে প্রাঙ্গণে প্রার্থীদের ভিড় নেই। উচ্চ মহলের বা মাসলধারীদের চাপ নেই, যত দায়িত্ব সাধারণ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। ভর্তির ব্যাপারে এ বছরের শুধুমাত্র সরকারী স্কুল-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বেসরকারীদের জন্য প্রাণান্তকর অবস্থা করে তুলেছে। কেননা উপরে পড়া ক্রোধ এখন এদিকে প্লাবন তৈরি করছে। শতকরা চল্লিশ জনকে কমপক্ষে পাস করাতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর এমন শর্ত আরোপের কথা শোনা যাচ্ছে। প্রশ্ন তাতেও। বিশাল জনময়দান তুল্য এক-একটি শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার্থীদের উত্তীর্ণ করার গ্যারান্টি কি করে সম্ভব হতে পারে?

শিক্ষার কল্যাণে শিক্ষার হার বাড়াতে যত উদ্যোগই নেওয়া হোক, তার সূত্র খুঁজতে হবে এই ভর্তির দৃশ্যাবলী থেকে। দৈনিক পত্র-পত্রিকায় ভর্তিপ্রার্থীদের ভিড়ের প্রচন্ডতা বার্ষিক আবর্তক ছবি। ভর্তির জন্য অভিভাবক—শিক্ষার্থীর আকুতি বর্ণনাতীত। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ক্রমে বাড়ছে। প্রগতির যুগে মূল্যবোধের পরিশীলনে শিক্ষার স্থান মানুষের মধ্যে প্রথম কাতারে। অথচ সেই শিক্ষার পথই এখন অবরুদ্ধ হয়ে উঠছে ক্রমে ক্রমে।

এই অবরোধ শিক্ষাঙ্গনে অবস্থিত আদর্শ ও আচরণের জন্ম দেওয়ার পথ সৃষ্টি করছে। অতীতেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান দেওয়া হয়েছে। তা ছিল উদার শিক্ষানুরাগী সভার অবদান এবং অবশ্যই নিঃস্বার্থ ছিল সে দান। একালে দান-অনুদান দেওয়া হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে। এই উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের। এ নিয়ন্ত্রণ বহুবিধ। ফলে স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয় আরও বেশী করে। সবচেয়ে দরকার যে পরিবেশ, শিক্ষার জন্য সেই পরিবেশ যায় আরও দূরে সরে।

জীবন যাপনের শত সংকটে সন্ত্রস্ত সাধারণ মানুষ আজ অসহায় হয়ে পড়েছে সন্তানের শিক্ষা নিয়ে। বিদ্যালয়ের পাঠে আজ বিদ্যার্থীর বিদ্যা অর্জন হয় না, এজন্য অভিভাবকের ব্যয়বহুল পথ ধরে চলতে হয়। অথচ এমন ব্যয়ের সাধ্য তাই মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ আর হয় না। এমনকি তাদের সুপ্ত সম্ভাবনাও থেকে যায় অজানা।

দরিদ্র ছাত্রের মেধা মার খেয়েছে চিরকাল, এ সত্য; কিন্তু সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার ঘরের মেধাবী ছাত্রছাত্রীর যে দুর্দশা এখন শুরু হয়েছে, তা ছিল না আর কোন কালেই। টাকার বিজয়টা ক্রমেই প্রকট হতে আরম্ভ করছে। বিপুল অংক ঢালতে সক্ষম হলে ভাল স্কুলে ভর্তি যেমন সম্ভব, তেমনি টাকার গুণেই একাধিক গুরুর সংস্পর্শ লাভ সহজ। শিক্ষার উপকরণ সাধারণ ঘরের জন্য আরেক ভয়। কাগজ, কালি, কলম, বই সরবরাহের সমস্যারও তুলনা নেই। বই সব সময় মেলে না, কাগজের দামের অত্যাশ্চর্য ঊর্ধ্বগতি। নিউজ প্রিন্টও সুলভ নয়। সব মিলিয়ে বলা যায়, সাধারণ ঘরে অসাধারণ মেধা নিয়ে জন্মালেও জন্ম অপরাধ থেকে পরিত্রাণ নেই।

ভর্তি-সংকট, শিক্ষক-সংকট, শিক্ষা-উপকরণ সংকট, স্কুলে যাওয়া আসার সংকট, গৃহকোণে প্রশান্তির সংকট-শত সংকটে জর্জরিত এক একজন শিক্ষার্থী। এদের ভবিষ্যৎ কি? নিরুপায় অভিভাবক অস্থিরতার তীব্র মুহূর্তে দায়ী করেন অবোধ শিক্ষার্থীকে-এমনি করে অজস্র সম্ভাবনার মৃত্যু হয় তিলে তিলে।

এ কথা উপলব্ধি করার সময় এসেছে শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেঝুট ঝামেলা ও অনাবশ্যক জটিলতা থেকে দূরে রাখার প্রয়োজন আছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক মনোভঙ্গী কোনও অবস্থায়ই সমর্থনযোগ্য নয়। শিক্ষার সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক নিবিড় করে তোলায় লাভ নেই, বরং ক্ষতি অপূরণীয়। মুষ্টিমেয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুদানভিত্তিক ভর্তি অন্যদের জন্য নানাভাবে ইন্ধনের কাজ করে। তাই এ সম্পর্কে প্রতিবাদী হতে হবে। প্রতিকার না হলে এর পরিণতি ভয়াবহ হবে।

—হোসনে আরা শাহেদ